

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দীন শিক্ষা দিবো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা

রোলঃ 216021163

২ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা

রোলঃ 216021163

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে সালমা, আইডিঃ 216021163 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সট্রিনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সন্তানকে কেন দীন শিক্ষা দিবো” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আল্লামা

(স্বাক্ষর)

উম্মে সালমা

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

আইডিঃ 216021163

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:.....	5
সন্তান পালনে ইসলামের প্রেরণা:.....	7
প্রথম পাঠশালা মায়ের কোল:.....	7
সন্তানের প্রতি পিতা সदा জাগ্রত থাকা:	9
সন্তানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করা:	10
সন্তানকে উত্তম তারবিয়াত শিখানো:.....	11
সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের দায়িত্ব:	16
পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আদর্শ:.....	20
বয়সক্ষিকালে সন্তানের প্রতি বাবা মায়ের দায়িত্ব:.....	21
সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা:.....	23
সন্তানকে সালাম ও শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস করানো:.....	24
শয়তান এবং বদনয়র থেকে বাঁচতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাতলে শিশুদের রক্ষাকবচ:.....	26
সন্তানের অন্তরে ইমানের বীজ বপন:.....	27
নেককার সন্তান পরকালের বাবা মায়ের মজ্জির উপায়:.....	28
সন্তানের নৈতিক শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা:	32
মা-বাবার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয়:.....	33
কল্যাণ কামনা	34
ঋণ পরিশোধ ও অসমাপ্ত ভালো কাজ পূরণ করা	35
উপসংহার:.....	36
তথ্যসূত্র	38

ভূমিকা:

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্ব ও ইবাদাত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে। দাসত্ব বলতে সংক্ষিপ্ত কিছু রীতিনীতি নয়; বরং ব্যাপক অর্থের দাসত্ব। যে দাসত্ব জীবনের সকল ক্ষেত্রে টেকে নেবে। আর এই দাসত্ব বাস্তবায়িত হয় শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মানুষদের মাধ্যমেই। ফেরেশতাদের দিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে সাজদা করানো এবং সমস্ত কিছুকে মানুষের অনুগত করে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির সর্বোচ্চ সম্মানের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তিনি নিজ অনুগ্রহে

অমিলের সমস্ত কিছুকে।

সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে আপনার জন্য। আপনা আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। বলেছি সেই উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দাসত্ব আর করা।

এখন এই মহান লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে, সম্মান ও মর্যাদার উপাবলি অর্জন ক আপনার জন্য আবশ্যিক। এই গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই ইজ্জত ও শক্তির অধিকার হওয়া সম্ভব, দুনিয়ার বুকে একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া সম্ভব। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

“যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করে।”

তাই এই অন্তরকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করলে নিজেরই উপকার। সেই সাথে চিরস্থায়ী জান্নাত তো রয়েছে।

অপরদিকে যে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকবে, নিজের চূড়ান্ত গন্তব্যকে ভুলতে বসবে সে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে।

"আর তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছেন।

তাদের নিজেদের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছেন' এর অর্থ হলো। নিজ কল্যাণে কাজ করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং সেই মহান উদ্দেশ্যকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন যার কারণে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে!

“সুতরাং তাদের ۞ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ”
ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো এসবের মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান। আর তিনি চান, তাদের আত্মা যেন কাফির অবস্থায় দেহত্যাগ করে।”[৬]

মৃত্যুর পর সন্তানেরা আমার প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হাদীসের ভাষ্যমতে তিনটি আমলের সাওয়াব বন্ধ হয় না। তার মধ্যে একটি হলো,

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

“নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করবে।”[]

কিন্তু নেক সন্তানের পরিচয় কী? নেক সন্তান হলো সে, যার অন্তর মহৎ ও সম্মানিত। যাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। আর সন্তান গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়াকেই সহজ ভাষায় বলা হয় তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন (প্যারেন্টিং)।

সন্তান পালনে ইসলামের প্রেরণা:

ইসলাম যেসব দিক বিবেচনায় নিয়ে মানুষকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে সন্তান জন্ম দেয়া তার অন্যতম প্রধান কারণ। সন্তানের মাধ্যমে বিবাহিত জীবনের স্বার্থকতা ফুটে ওঠে। বিবাহিত মানুষ মাত্রই সন্তান কামনা

করেন। বিশেষত নারীদের দৃষ্টিতে। আপন জন্মের স্বার্থকতাই সন্তান জন্ম দেবার মধ্যে বলে মনে করেন নারীরা। নিঃসন্তান দম্পতিরাই জানেন সন্তান কতটা আরাধ্য। ইসলামে সন্তান লালন-পালনের ফজিলত: আবুহুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أُنِّي لِي « هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ

'জান্নাতে নেকব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি হবে করা হবে ।

সে বলবে হে রব,,,

কিসের সৌজন্যে আমার এ মর্যাদা? আল্লাহ বলবেন,

তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তেগফারের বদৌলতে।' [ইবনমাজা :

১০৬১৮]

প্রথম পাঠশালা মায়ের কোল:

একটি শিশুর জন্য জীবনের প্রথম আবাস ও আশ্রয়স্থল হলো মায়ের কোমল ও মায়ামাখা কোল। মায়ের কোলের সময়গুলোতে শিশুর জন্য মা একজন কাণ্ডারী ও দরদী সেবক হিসেবে কাজ করে। মা যদি শিশু সন্তানের উপর মেহনত করেন তবে এই শিশু তার মায়ের কোল থেকেই ভালোবাসা ও দয়ার পরশে সুন্দর চরিত্র ও যোগ্যবান হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এজন্য সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একজন মায়ের দায়িত্ব ও দায়-ভার সবচেয়ে বেশি এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তায়ালা যখনই মানুষকে সন্তানাদির নেয়ামত দেন, তখন থেকেই তাদের সুষ্ঠু-সুন্দর প্রতিপালন পিতা-মাতার দায়িত্বে এসে পড়ে। তারা শিশুটির বাহ্যিক এবং আত্মিক মুরব্বি বা গুরু হয়ে যান। তাই একজন বাবা-মা যেমনিভাবে সন্তানের সুষ্ঠু সুন্দর ও সুঠাম দেহ গঠনের জন্য দিনরাত ফিকির করবেন; পাশাপাশি সন্তান যেন জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং শিষ্টাচার ও ভদ্র আচরণ শিখে; তার জন্য চেষ্টা করাও পিতা-মাতার দায়িত্ব।

যখন কোনো পিতা-মাতা তাদের সন্তানের লালন-পালন সঠিক সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে করেন তখন এর দ্বারা শিশুর সুন্দর দেহই গঠন হয় না বরং এর ফলে শিশুর উন্নত চিন্তা ও মানসিকতাও তৈরি হয়।

এই জন্য বিজ্ঞজনেরা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে আদব শেখায়, সে শত্রুকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে।'।

কোনো কোনো মনীষী এভাবেও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে শিশুকাল থেকেই আদব শেখায়, বড় হয়ে সে তার চক্ষুকে শীতল করে।'। এজন্য সন্তানের সুন্দর তারবিয়াতের ব্যাপারে পিতা-মাতার উদাসিন থাকা উচিত নয়। কেননা, যে কৃষক তার ক্ষেতে ঠিকমত মেহনত করে না, ফসলের সঠিক পরিচর্যা করে না, তার জমিতে নানান ধরনের আগাছা জন্মায় এবং এক সময় তার ফসলই বিনষ্ট করে দেয়। ঠিক তেমনিভাবে বাবা-মা যখন শিশুর লালন-পালনের কোনো খেয়ালই করেন না, তখন শিশুটির মাঝে বিভিন্ন ধরনের বদস্বভাব সৃষ্টি হতে থাকে; যা তার ভবিষ্যৎ-জীবনে উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এরশাদ করেছেন, 'প্রতিটি শিশু জন্মগতভাবে ইসলামের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বা মূর্তির উপাসক বানায়।' অর্থাৎ জন্মগতভাবে প্রত্যেক শিশুই ভালো স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা এবং পরিবেশ তার পথ ও লক্ষ্যকে পরিবর্তন করে দেয় এবং তার শান্তিময় জীবন ও আখেরাতকে নষ্ট করে দেয়। মূলত একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার উপর তিনটি জিনিসের প্রভাব কাজ করে।

(১) সর্বপ্রথম শিশুর বাবা-মা, পরিবার-পরিজন এবং বংশের প্রভাব

কাজ করে ।

(২) দ্বিতীয়ত তার পরিবেশ ও প্রতিবেশীর প্রভাব কাজ করে ।

(৩) অতঃপর শিশুটি যখন কোনো মাদরাসা বা স্কুলে শিক্ষা অর্জন করতে যায়, তখন সেই প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয় ।

কিন্তু সর্বশেষ পিতা-মাতার উপরই দায়িত্ব আসে, তার সন্তানের এই তিনটি ব্যাপারেই খেয়াল রাখার যে, আমার সন্তান কোন্ পরিবেশ ও চিন্তা-চেতনায় বড় হচ্ছে ।

সন্তানের প্রতি পিতা সদা জাগ্রত থাকা:

যে পিতা ঘরের অবস্থা সম্পর্কে অসচেতন এবং সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও অমনোযোগী; তার সন্তান লাইনচ্যুত এবং বিপথগামী হয়ে থাকে । যেমন : কেউ কেউ নিজের ব্যবসা-ব্যাগিজ্যে ব্যস্ততার দরুন সংসারে ছেলে-মেয়ের খোঁজ-খবর রাখতে সময় পান না, ফলে তাদের সন্তানদের বেড়ে উঠা যথাযথ হয় না । উন্মুক্ত ও উশৃঙ্খল জীবন তাদের পেয়ে বসে । এজন্যই বলা হয়ে থাকে-

ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

‘সে এতিম নয় যার মা-বাবা মৃত্যুবরণ করেছে, বরং এতিম তো সে, যে ইলম ও আদব শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে ।

একথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যে সন্তান তার মায়ের শাসন মানে না, আর অপরদিকে বাবার পক্ষেও সম্ভব হয় না ঘরে সময় দেয়ার; তো সেই শিশু জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে ঠিক, কিন্তু তার জীবিত থাকাটা কোনো এতিম শিশুর জীবিত থাকার মতোই ।

সুতরাং একথা শুনে রাখা উচিত, যে মায়ের এ বিষয় জানা নেই, সন্তানকে কিভাবে শাসন করতে হয় । অন্যদিকে বাবারও এ নিয়ে ভাবনার সময় হয় না; তবে নিশ্চিত জেনে নিন, সেই শিশুটি এতিম সমতুল্য, তার সুষ্ঠু লালন-পালন হওয়া কখনোই সম্ভব

নয়। অতএব জন্মদাতা পিতা-মাতার জন্য একান্ত আবশ্যিক, তারা যেন ঘরের সকল কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানের লালন-পালনের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে দেখেন। এবং নির্দিষ্ট একটি সময় তাদের পেছনে

ব্যয় করেন। হয়তো এজন্যই কেউ বলেছেন, যখন আমি অবিবাহিত ছিলাম তখন সন্তানের লালন-পালনের পাঁচটি নানামুখী পরিকল্পনা (planning) ছিল। আর এখন বিয়ের পর আমার পাঁচটি সন্তান, কিন্তু সন্তানদের লালন-পালনের পরিকল্পনা থেকে একটি পরিকল্পনাও আমার মাথায় নেই।

এমনই হয়, নিজে নিজেকে নানামুখী এতো কাজে ব্যস্ত রাখে যে, নিজের সন্তানের একটু দেখাশোনার সময় সুযোগও হয়ে ওঠে না। সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য অবশ্যই নিজেকে সময় বের করতে হবে। তাহলেই সন্তান হবে যোগ্য, আমরা হব গর্বিত। আর এই উম্মতের নতুন প্রজন্ম পাবে দ্বীন ও আখেরাতের জন্য একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ধারক বাহক।

সন্তানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করা:

শিশুর জন্য জরুরি কাজ হলো, শিশুকে ছোটকাল থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করা। এটা মা-বাবার দায়িত্ব। তাকে একথা বুঝানো, ‘আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে পছন্দ করেন, অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, ‘পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক’, এখন একথা কেউ মনে করতেই পারে, আল্লাহ তাআলা তো সন্তানের পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেছেন, সুতরাং সে নিজে নিজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা শিখে নেবে। বিষয়টা এমন নয় বরং ভালো সন্তান এমনিতেই সৃষ্টি হয় না। ভালো সন্তান তো শিক্ষা দিয়ে তারবিয়াতের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয়। আদর্শ মা তার স্নেহময়ী কোল থেকেই ভালো করে গড়ে দেন। গ্ররমের মৌসুমে সন্তানকে প্রত্যেক দিন গোসল করানো। জামা কাপড় ময়লা দেখলে সাথে সাথে পালটিয়ে দেওয়া। বিছানা কখনো অপবিত্র অবস্থায় রেখে না দেওয়া; সাথে সাথে পরিষ্কার করে নেওয়া। মোটকথা, সন্তানের জন্য নিয়মতান্ত্রিক এই

সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়া এটাও 'দ্বীন-ইসলাম' মানার শামিল। এর জন্য মা বিনিময়ে অবশ্যই অনেক সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারিনী হবেন। তাই প্রথম থেকেই শিশুর লালন-পালনের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা অবশ্য কর্তব্য।

সন্তানকে উত্তম তারবিয়াত শিখানো:

১. শিশুকে সুন্দর ভাষায়, আদবের সাথে কথা বলা শিক্ষা দেওয়া

উচিত। কোনো কোনো শিশু 'তুমি, তোমরা' বলে সম্বোধন করে। তাদেরকে বুঝানো যে, বেটা! 'আপনি' বলার দ্বারা মুহাব্বত বাড়ে। তাই ছোটদেরকেও আপনি বলে ডাকো, এবং বড়দেরকেও আপনি বলে সম্বোধন করো। শিশু যদি শুধু 'হ্যা' বলে, তবুও তাকে শেখানো, বেটা, 'জী হ্যাঁ' বলার দ্বারা মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। এভাবে ছোট ছোট কথাগুলো শিশু তার মায়ের কোলেই শিখে নেবে। পরবর্তীতে এগুলো তার স্মরণে গেঁথে যাবে, অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। স্মরণ রাখতে হবে, মানুষ তার ছোটবেলার কথা, শৈশবের স্মৃতি বার্ষিক্যেও ভুলে না। সারাজীবন তা স্মরণে রাখে। এজন্য শিশুসন্তান লালন-পালন যেন সুন্দর থেকে সুন্দর হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটা শত সিদ্ধ কথা, যে ঘাস বন-জঙ্গলে ডালে-খালে জন্মায় তা বাগানের চাষ করা ঘাসের মতো হয়। না। জঙ্গলে জন্মানো ঘাসের মাঝে কোনো সৌন্দর্য থাকে না। কারণ, এর পরিচর্যা হয় না। আর নার্সারী বা বাগানের ঘাস খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় এবং মনমাতানো হয়।

ঠিক তেমনি ভাবে, যে মায়ের মধ্যে দ্বীন-ধর্মের কোনো ভালাই নেই, শিক্ষা-দীক্ষার কোনো আলো নেই। এমন মায়ের লালিত-পালিত সন্তান জঙ্গলের ঘাসের মতো হয়। আর যে মা নেককার হয়, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় আদর্শবান মা হয়, এমন মায়ের লালিত-পালিত সন্তান নার্সারী বা বাগানের সু-সজ্জিত, মন জুড়ানো ঘাসের মতো হয়। তাই সকল মা যেন তার নিজ কলিজার টুকরা সন্তানের সুন্দর প্রতিপালনের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখেন।

২.তারবিয়াত হলো ইজ্জত-সম্মান, লাজুকতা, দয়া-মমতা, মানবিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ, জুলুমের প্রতিরোধ, আল্লাহর জন্য ক্রোধ, ঈমানি আত্মমর্যাদাবোধ, সৎকাজে আদেশ দান, অসৎকাজে বাধা প্রদান, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইত্যাদি গুণের ওপর সন্তানদের গড়ে তোলা। বিভিন্ন উপায়ে আজকের পৃথিবীতে এই গুণগুলো ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, ফিল্ম, কার্টুন ও গেইমসের মাধ্যমে সুচিন্তিতভাবে লজ্জাশীলতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে শিশুমনে কঠোরতা ও সহিংসতা জন্ম নিচ্ছে।

৩.তাদেরকে চিন্তা-গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। কীভাবে সে সঠিক প্রশ্ন করবে, মনের ভাব ব্যক্ত করবে, বিকৃত ও সঠিক জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করবে, হঠাৎ উদ্ভিত হওয়া বিভিন্ন চিন্তার কীভাবে যথাযথ খণ্ডন করবে, বিভিন্ন তথ্য কীভাবে যাচাই করবে, কীভাবে সে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করবে, তাদের প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে ইত্যাদি বিষয় তাদের শিখিয়ে দেওয়া।

৪.নিজেকে আবিষ্কার করার পথে সন্তানদের সহযোগিতা করা। তাদের প্রতিভাকে সঠিক খাতে ব্যয় করা। সন্তানের সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন লক্ষ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গ দেওয়া। জীবনের যে উদ্দেশ্যই সে বেছে নিক না কেন, যেন উম্মাহর মর্যাদার সুদীর্ঘ অধ্যায়ে সেও অংশগ্রহণ করে।

৫.সন্তানদের এই বলে শিক্ষা দিন : যে “নিজের মতো হও”। নিজেকে গ্রহণ করো। অন্যের ব্যক্তিত্বকে ধারণ করবে না। কাউকে যদি তুমি এমন কোনো কাজ করতে দেখো যা তুমি নিজে বাস্তবায়ন করতে পারো না, তখন নিজেকে ব্যর্থ ভাববে না। তোমার সাথে খাপ খায় না এমন কোনো কিছুকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে।” মনে রাখবেন, এসব কথা ছাড়া আপনার সন্তান কখনোই পরিতৃপ্ত ও সুখী হবে না।

৬.সন্তানদের নিকট অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর স্পষ্ট করা। আমি কে? আমার সৃষ্টিকর্তা কে? আমার শেষ পরিণতি কী? আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? আমি মুসলিম কেন? কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ কী?

নবি **-এর নুবুওয়াতের দলীল কী? যে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে আমি সারাটি জীবন কাটাবো সেগুলো কীভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে? এরকমভাবে সন্তানদের দ্বীনের সমস্ত মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

৭.তারবিয়াত মানে এই নয় যে, কোনো ২২ বছর বয়সী যুবক ১৮ বছর বিভিন্ন স্কুল ও ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়ে দেবে অথচ সে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানবে না। কীভাবে চিন্তা করতে হয় সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা থাকবে না। একটি শব্দ তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দেয় তো অন্য আরেকটি শব্দ তাকে ঈমানহারা করে ছাড়ে। নিম্নমানের কোনো একটি লেখা কিংবা ছোট্ট একটি ভিডিও ক্লিপ খুব সহজে তার ঈমান হরণ করে নেয়! সঠিক চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা বা বৈজ্ঞানিক কোনো পর্যালোচনা ছাড়া সে খুব সরলভাবে তর্ক জুড়ে দেয়। এরপর নিজেকে কখনো শিক্ষিত, কখনো ইঞ্জিনিয়ার, কখনো ডাক্তার এমনকি কখনো-বা প্রফেসর হিসেবে পরিচয় দেয়!

৮.ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত বীরদের সাথে সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উম্মাহর বীরত্বের ইতিহাস তাদেরকে জানানো। যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদেরও গভীর শেকড় রয়েছে। তখন তারা ব্যভিচারী, মাদকাসক্ত কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভ্রান্ত সেলিব্রিটিদের পোশাক-আশাক, ছোটোবড়ো চুল এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে উম্মাহর পরিচয়ে গর্ববোধ করবে।

সন্তানদের প্রতিটি কাজে এই প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত করে তোলা যে, আমি এই কাজটি কেন করব? মনে রাখবেন এই একটি প্রশ্ন তাকে অন্ধ অনুকরণ করা থেকে রক্ষা করবে।

অনুপ্রবেশ করা বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে

সন্তানদের মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। যাতে গণমাধ্যমগুলো মানসিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে তারা তা খুব সহজেই ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। আমার মনে পড়ে, আব্বাজান এরকম কিছু বিষয় থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে প্রায়ই আলোচনা করতেন। তার সেই আলোচনা আমাদের বেশ প্রভাবিত করেছিল, সঠিক পথ চিনে নিতে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল।

৯. সন্তানদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ তৈরি করে দেওয়া। সেটা দ্বীনি জ্ঞান হোক বা অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান। তারা যেন বিভিন্ন বই ও সিরিজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রাখে। তাদের বলুন, 'উপকারী যত জ্ঞান রয়েছে, তা জানতে আগ্রহী হও, বেশ পরিশ্রম করো।' এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস গেইমসে মগ্ন থাকা, অশ্লীল ভিডিওতে আসক্ত হওয়া এবং বিভিন্ন ইউটিউবারদের গুরুত্বহীন কথাবার্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। যখন পড়াশোনায় তাদের মন ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকবে তখন এসব অনর্থক বিষয় তাদের স্পর্শও করতে পারবে না, তাদের সে সুযোগও হবে না।

১০. যুগের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের প্রতি সন্তানদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। ফলে সে প্রভাব বিস্তারকারী একজন সফল মুসলিমে পরিণত হতে পারবে। টেকনোলজির ব্যবহার, অর্থ ব্যবস্থাপনা, আশ্বস্ত করতে পারা, নেতৃত্ব দেওয়া, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে দক্ষতা অর্জনে সহযোগিতা করতে হবে।

১১. সন্তানের জন্য সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা। প্রিয় বোন, আপনার সন্তানের জন্য একজন উত্তম বন্ধু তালাশ করুন। এমনকি যদি প্রয়োজন পড়ে তা হলে বিভিন্ন দীনদার ও শিক্ষিত অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

১২. সন্তানকে পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শিখিয়ে দেওয়া। যেন সে ভাইয়ের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে আর বোনের প্রতি হয় স্নেহশীল।

১৩.সন্তানদের দৃঢ়তা শিক্ষা দেওয়া। যেকোনো ধরনের ফলাফল গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত করা। জীবনে দুঃখ-কষ্ট যা আসবে তার মোকাবিলা করা এবং খারাপ ফলাফল সম্ভূষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, তারা এখানে প্রশান্তি কিংবা নাজ-নিয়ামাতে ডুবে থাকতে আসেনি। এই দুনিয়া প্রতিদান পাওয়ার স্থান নয়, বরং পরীক্ষার স্থান।

১৪.সন্তানদের কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা। তাদের মাঝে কুরআন বুঝার সক্ষমতা এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করার যোগ্যতা তৈরি করা। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের ভেতর আরবির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া যাবে।

১৫.সন্তানদের এই শিক্ষা দেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারেই মুমিন তার জীবন পরিচালনা করবে। এই বিধান ছাড়া অন্য কোনো সংবিধানকে যেন তারা স্বীকার না করে। বিশেষ করে এই সময়ে তাদেরকে আরও বেশি সচেতন করতে হবে, যখন দ্বীন বলতে কেবল নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ কতিপয় অনুষ্ঠান পালনকে বুঝানো হচ্ছে, যখন সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত হচ্ছে জনগণের চাহিদা ও প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে।

১৬.সন্তানের নিকট আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর সম্মান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করা। এই ভালোবাসা যেন সমস্ত ভালোবাসাকে হার মানায়। তাওহীদকে দূষিত করে এমন সব বিষয় থেকে তারা যেন নিজেদের রক্ষা করে চলে।

১৭.সন্তানের নিকট উম্মাহর পরিচয়কে বড়ো করে তোলা। যেন সে উম্মাহর বর্তমান অবস্থাকে গুরুত্বের সাথে দেখে। হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে ইতিবাচক কাজ করতে সক্ষম হয়।

১৮.সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। ভালোবাসা, আস্থা, গুরুত্ব ও সততার প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমেই এই সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। তাদের সকল সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করতে হবে। এসব করা ছাড়া উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

১৯.বয়সের প্রতিটি স্তরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সন্তানদের পরিচিত করে তোলা। এই ক্ষেত্রে তাদের সাথে গল্প করা, খেলায় অংশ নেওয়া বা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে তাদের নিকট ব্যাপারটি খোলাসা করা যেতে পারে।

২০.ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে সন্তানদের সামনে যেসব জটিলতা বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেগুলোর সমাধানে তাদেরকে সহযোগিতা করা। সেই সাথে তাদের শারীরিক রোগবাহাইয়ের দিকেও খেয়াল রাখা জরুরী।

সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের দায়িত্ব:

পৃথিবীতে মা-বাবাই সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। সন্তানরাও বাবা-মায়ের কলিজার টুকরো; সবচেয়ে আপনজন। সুসন্তান পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তির এবং পরকালে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। ধন-সম্পদ, প্রাণ ও বংশপরম্পরা রক্ষার হাতিয়ার। সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য, যা পাওয়ার অধিকার প্রতিটি সন্তানের রয়েছে। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি-সন্তান জন্মের পর তার কানে এক আল্লাহর কথা পৌঁছে দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে সুন্নত হলো, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া। আবু রাফে (রা.) বলেন, ‘আমি মহানবী (সা.)-কে দেখেছি, ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করলে তিনি তার কানে নামাজের আজানের মতো আজান দিয়েছেন।’ (তিরমিজি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩)

শিশু যখন কথা বলতে শুরু করবে, তখন সর্বপ্রথম তাওহিদের বাণী শেখানোর কথা হাদিসে এসেছে। মহানবী (সা.) বলেন, ‘যখন তোমাদের সন্তান কথা বলতে শিখে তখন তাদের কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিক্ষা দাও।’ (বায়হাকি)

মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে নামের মাধ্যমে। দুনিয়ার এ নামেই পরকালে তাকে ডাকা হবে। নামের একটি প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। তাই বাবা-মায়ের কর্তব্য হলো তার সন্তানের একটি অর্থবহ নাম রাখা। মহানবী (সা.) অর্থবহ নয় এমন অনেক নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রেখেছেন। যেমন আবদুল ওজ্জা নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন আবদুল্লাহ, আসিয়া নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন জামিলা। বুররা নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন জয়নব।

শিশুর জন্মের সপ্তম দিন আকিকা করা সুন্নত। মহানবী (সা.) বলেন, ‘প্রতিটি শিশু তার আকিকার সঙ্গে বন্ধক থাকে। সুতরাং তার জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু জবেহ করবে, মাথার চুল মুগুন করবে ও নাম রাখবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ছেলের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকিকা করবে।’ (বায়হাকি)

বাবা-মায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো পুত্রসন্তানের খতনার ব্যবস্থা করা। এটি সুন্নতে ইবরাহিমি। ইবরাহিম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে নিজের খতনা নিজে করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, মানবীয় স্বভাবসম্মত কাজ পাঁচটি। এর মধ্যে একটি হলো খতনা। (সহিহ বুখারি, হাদিস : (৬২৯৭))

সন্তানকে যথাযথভাবে লালনপালন করা বাবা-মায়ের কর্তব্য। সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। আদর-যত্নে তাদের গড়ে তুলতে হবে। মহানবী (সা.) হাসান-হোসাইন (রা.)-কে চুমু দিতেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি

রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, ‘আপনারা কি শিশুদের চুমু দেন, আমরা তো চুমু দিই না। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বলেন, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেন, তাহলে আমার কী করার আছে!’ (বুখারি ও মুসলিম)

বাবা-মায়ের প্রধান দায়িত্ব হলো সন্তানকে সুশিক্ষা দান করা। একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর কী কী আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া ইসলামের অন্যতম ফরজ। মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৪)

সন্তানের চারিত্রিক দিক দেখাও বাবা-মায়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাদের সুন্দর আদব-আখলাক শেখাতে হবে। নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের পাঠ দিতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, ‘বাবা স্বীয় সন্তানকে শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু শেখাতে পারে না।’ (তিরমিজি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪২৩)

বাবা-মায়ের অন্যতম দায়িত্ব হলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হয় তখন নামাজ পড়ার তাগিদ দাও। যখন ১০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন নামাজ পড়ার জন্য শাসন করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৫) সন্তানকে আদব-কায়দা ও সুশিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়াও করতে হবে। সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে থেকেই তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহতায়ালা। সন্তানের জন্য দোয়া করতে গিয়ে জাকারিয়া (আ.) বলেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে নেক সন্তান দান করুন, অবশ্যই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৮)

সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা বাবা-মায়ের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা বিয়েহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন

করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন।' (সূরা : নূর, আয়াত : ৩২) মহানবী (সা.) তিনটি কাজ দ্রুত করতে বলেছেন। এক. ওয়াজ্ত হলে নামাজ পড়া। দুই. ছেলেমেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা। তিন. জানাজা উপস্থিত হলে জানাজা পড়া। (তিরমিজি, হাদিস : ১০৭৫)

ওযুর সহিত খানা পাকানোর সুফল:

আপনি যখন কুরআন পড়ে, যিকির-আযকার করে খানা পাকাবেন; আর এ খানা ঘরের কর্তা যখন খাবে, তো তার দিলে নেকী এবং ভালো কাজের চাহিদা তৈরি হবে। সন্তানরা খাবে, এতে তাদেরও দিলে ভালো অভ্যাসের বীজ অঙ্কুরিত হবে। আমরা যা কিছু খাই এগুলোই আমাদের শরীরে গোস্টের রূপ ধারণ করে। এখন যদি এ খানা আল্লাহ তাআলার যিকিরের সাথে পাকানো হয় তবে সু-নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, ওই খানার ফলে শরীরের শিরা-উপশিরায় আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতের তৃষ্ণা পয়দা হবে। পক্ষান্তরে যদি হারাম খানা অথবা দুআ ও যিকির আযকারহীন (গাফলতের সাথে) পাকানো খাদ্য খায়, তবে এর দ্বারা শরীরে যে শক্তি সংগ্রহ হয়, মানুষ তা অন্যায় কাজে ব্যয় করে থাকে। যে মা তার আদরের সন্তানটিকে পবিত্র ও হালাল খাদ্যের মাধ্যমে বড় করেন, যেন তার সন্তানকে অর্ধেকের চেয়েও বেশি গড়ে দিলেন, মানুষ করে দিলেন। সন্তানকে নেককার ও ভালো মানুষরূপে গড়তে এটা এমনই বিরাট প্রভাব রাখে। সুতরাং সন্তানকে যিকিরওয়ালা খানা খাওয়ানো, ওযুর সাথে খানা খাওয়ানো, আল্লাহ তাআলা এর সুফল শিশুর জীবনে অবশ্যই দান করেন।

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আদর্শ:

এ বিষয়টি অবশ্যই জেনে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি শিশুকে জন্মগত-ভাবেই অনুকরণ প্রিয় বানিয়েছেন। শিশু তার বড়কে যা করতে দেখে ছবছ সে ঐ কাজটিই করতে উদ্ভূত হয়। সে বড়দের মতো হতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। তাই সন্তান প্রথমত তার বাবা-মাকেই অনুসরণ করে থাকে। এই জন্য মা-বাবার উচিত, তারা যেন শুধু সমালোচকই না হন, অর্থাৎ এটা কেন করলে? এভাবে করলে কেন? এটা ওইভাবে হওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি। মোটকথা শুধু শাযাতেই না থাকা। হুমকি ধামকিতেই না রাখা, বরং সন্তানের সামনে পিতা-মাতা নিজেদেরকে আদর্শবান হিসেবে তুলে ধরা। শিশুকে হুমকি-ধামকি করার চেয়ে তার সামনে সুন্দর আদর্শ পেশ করাটাই অধিক উপকারী। শাসন তো দুনিয়ার সকল মানুষই করতে পারে, কিন্তু শিশুর জন্য নিজে পরিশুদ্ধ ও আদর্শবান হওয়া এটা কয়জন পারে। তাই বাবা-মায়ের উচিত, তারা যেন সন্তানের সামনে আদর্শ পিতা-মাতা হিসেবে জীবনযাপন করেন। তারপর দেখবেন, শিশু নিজে নিজেই মা-বাবার প্রতিটি কাজের ছবছ নকল করবে। মেয়ে তাই করবে, যা সে মাকে করতে দেখবে। ছেলেও তাই করবে, যা বাবাকে করতে দেখবে। একবার আমাদের এক বন্ধুর মেয়ে খানা খাচ্ছিল। খানা খাওয়ার মাঝে পানি পান করল। কিছুটা বড় চুমুকে পান করল। এতে দম আটকে ঢেক উঠতে লাগল। সন্তানের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে দেখে মা তার পিঠের উপর হালকা ভাবে এক দুইবার হাত মারল এবং সাথে এটাও বলতে লাগল, বেটি! আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে গেল। অনেক দিন পর কিছু একটা পান করতে গিয়ে ওই মায়েরও একই অবস্থা হলো। আল্লাহর কি কুদরত, ঘটনাস্থলে মেয়েটি তখন মায়ের কাছেই ছিল। তখন সেই শিশুমেয়েটিও মায়ের পিঠে হাত মেরে মেরে বলতে লাগল, আম্মু! আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। অর্থাৎ মেয়েটি ছবছ ঐ সকল শব্দগুলোই বলল, যা সে তার মাকে বলতে শুনেছিল। আরেক দিনের ঘটনা, আমাদের আরেক বন্ধু যিনি সরকারি চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তার একটা অভ্যাস ছিল, যখনই কোনো ফোন আসত রিসিভ করেই বলতেন, (chief engineer is speaking) চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলছি। অর্থাৎ তার অধিকাংশ ফোন অফিসিয়াল সংক্রান্ত থাকতো। তাই তিনি সহজ পরিচয়ের জন্য এই শব্দই ব্যবহার

করতেন। তিনি তার একদিনের ঘটনা শোনালেন, একবার আমি গোসল সেরে বের হয়ে দেখলাম, ফোনের রিং বাজছে। আমার তিন চার বছরের ছেলেটি দৌড়ে ওই ফোনের দিকে গিয়েই ফোনটা উঠাল। এবং উঠিয়ে কানে লাগাতেই বলতে লাগল, 'চীফ ইঞ্জিনিয়ার বলছি'। এখানে লক্ষ করুন, ছেলেটি এই শব্দগুলোর অর্থও জানে না, কিন্তু সে ঐ কথাই বলছিল, যা সে তার বাবাকে বলতে শুনেছে। এ ঘটনা শোনানোর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো, সন্তান সর্বদা মা-বাবার আচরণের কপি করে। এখন যদি মা বাবা বলে যে, আমাদের যা খুশি এ জীবনে আমরা তাই করব, কিন্তু সন্তান ভালো ও সৎ হোক; এটা কখনোই হতে পারে না। উভয়টি একবারে বিপরীত জিনিস। অবশ্য মা-বাবা যদি আদর্শবান হন। বরণীয়, অনুসরণীয় হন তাহলে সন্তান খুব সহজেই তাদের অনুসরণকারী হবে। কিন্তু যদি মা-বাবা এ ব্যাপারে উদাসীন থাকেন, আর এই ভেবে সুধারণা করে বসে থাকেন যে, সন্তান অনেক বড় হবে এবং অনেক নেককার হবে। এরকম ভাবা একেবারেই অর্থহীন। যার সাথে বাস্তবতার কোনোই মিল নেই। এমনটা কখনো হয়নি, হতে পারেও না। এ জন্য সন্তানের সুন্দর লালন-পালনের জন্য বাবা-মাকে প্রথমে 'আমলী নমুনা' তথা বাস্তব নমুনা হওয়া আবশ্যিক।

বয়সস্কিকালে সন্তানের প্রতি বাবা মায়ের দায়িত্ব:

মা-বাবাদের একটি বড় দায়িত্ব সন্তান পালন করা। সন্তান যখন ১০ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে থাকে তখন এটি হয়ে ওঠে একটি কঠিন সময়। জীবনের এই সময়টিকে বলা হয় 'টিনএজ'। এ সময়ে বয়ঃস্কিকাল আসতে পারে। মা-বাবাদের উচিত সন্তানের জন্য ঘরগুলিকে একটি শান্ত এবং নিরাপদ জায়গা করে তোলা। এই ব্যস্ত পৃথিবী কিশোর-কিশোরীদের জন্য কঠিন বলে মনে হতে পারে। বাড়ি হল আমাদের নিরাপদ জায়গা। যেখানে আমরা সাহায্য এবং সমর্থন পেয়ে থাকি। কিন্তু কিভাবে কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাড়ি একটি আশ্রয়স্থল করা যায়?

১। সন্তানকে জানার চেষ্টা করুন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হল উদ্বেগ। তারা ধরেই নেয় যে, আপনি তাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, সমস্যা এবং জীবনের পরিস্থিতিগুলো বিচার করবেন। বেশিরভাগ শিশুই জানে যে, প্রাপ্তবয়স্করা তাদের চিন্তাভাবনাকে শিশুসুলভ এবং অপরিণত বলে মনে করে।

আপনি আপনার সন্তানকে জানার চেষ্টা করুন। তার সিদ্ধান্তগুলো শুনুন। এতে করে আপনার সন্তান মনের কথাগুলো আপনার সাথে ভাগ করে নিবে।

২। বিচার করার পরিবর্তে গ্রহণ করুন

সন্তানকে অবহেলা করা, ভুল বিচার করা বা উপেক্ষা করা হবে উদ্বেগের কারণ। যেকোনো পরিস্থিতিতে তাকে গ্রহণ করুন। গ্রহণযোগ্যতা ভালো পিতামাতার একটি গুণ। সন্তান ভুল করে থাকলে তাকে বোঝান। সৎ থাকার পরামর্শ দিন। তার কোনো কিছু নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করবেন না। এতে সন্তান আত্মবিশ্বাস হারাতে পারে।

৩। সন্তানকে বাচ্চা মনে করবেন না

কিশোর বয়স এমন একটি সময় যখন বাচ্চারা তাদের ব্যক্তিত্ব এবং শখ সম্পর্কে জানতে পারে। স্বতন্ত্র হওয়া থেকে আসে স্বাধীনতা। কিশোর-কিশোরীরা কঠোর নিয়ম, সময়সূচী এবং প্রত্যাশা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে। এ সময় তাদের একটু ছাড় দিন। এতে আপনার সন্তান হবে আত্ম-নির্ভরশীল। এই বয়সে সন্তানদের বাচ্চা মনে করে থাকলে তাদের বৃদ্ধিতে ব্যঘাত ঘটবে।

৪। নিরাপদ পরিবেশে লালন-পালন করুন

আপনার সন্তানকে কথা বলার জন্য নিরাপদ জায়গা তৈরি করুন। সে যদি ঘরেই কথা বলার সাহস না পায় তাহলে বাহিরে কী হবে, ভেবে দেখেছেন? নিরাপদ পরিবেশে গড়ে তুলুন। এতে আপনার সন্তান থাকবে প্রাণবন্ত। ভবিষ্যতে সমস্যা সমাধানে সহজ হবে। আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে।

৫। সহানুভূতিশীল হন

সন্তানের প্রতি রাগান্বিত হবেন না। এতে সে ভয় পাবে। ভবিষ্যতে অন্যায় কাজের সাথে জড়িয়ে যেতে পারে। তার প্রতি নরম থাকুন। এতে আপনার সন্তান অকপটে আপনার সাথে অনেক কিছু ভাগ করে নিবে। আপনি আপনার সন্তানকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত দিতে পারবেন।

সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা:

অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঘর হোক সুখময়-সন্তানকে মাঝে মধ্যে ঘরের ছোটখাটো কিছু দায়িত্ব দিতে পারেন। এতে সে নিজেকে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করবে এবং পরিবারের প্রতি তার আগ্রহ জন্মাবে। সেসব দায়িত্ব হতে পারে আপনাকে কোনো কাজে নিয়মিত সহায়তা করা অথবা গাছে পানি দেওয়া বা রুম গুছিয়ে রাখা; হতে পারে আপনাকে রান্নায় সাহায্য করা কিংবা দু-একটা গল্প পড়ে শোনানো। সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই উৎসাহ দিন নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে। যদিও অনেকেই এটাকে পরাধীনতা মনে করে। তবে প্রকৃতঅর্থে, নিয়ম মেনে চলা মানে পরাধীনতা নয়। বরং শৃঙ্খলা হচ্ছে জীবনকে গুছিয়ে চলা। পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠান বাদ দিবেন না। মাঝে মধ্যে ফ্যামেলি গেট-টুগেদারের আয়োজন করতে পারেন। এতে করে আপনার সন্তান পরিবারের বড়দের সান্নিধ্যে আসবে এবং পরিবারের কম বয়সী সদস্যদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

শখের কাজে উৎসাহ দিন-আপনার শিশু অতিরিক্ত লাজুক কিংবা অন্তর্মুখী হলে ছোটবেলা থেকে তার পছন্দের শখ বেছে নিতে সাহায্য করুন। যা ভালো লাগে তাই করতে দিন। তবে তাকে সেই কাজে অবশ্যই প্রথম হওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করবেন না। তার সৃজনশীল কোনো কাজের তুলনামূলক বিচার করবেন না। তার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য সে যা পছন্দ করে বা তার আগ্রহের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাকে নতুন তথ্য জানার সুযোগ করে দিন। দেখবেন, পরবর্তী সময়ে নিজেই গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো করে নিতে পারবে।

আত্মরক্ষার কৌশল শেখান-আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার একমাত্র সন্তান যেন নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে সেজন্য তাকে আত্মরক্ষা করতে শেখান। সন্তান একটু বড় হলেই আপনার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে মেলামেশা করার সময় শারীরিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখতে শেখান। তাই জুডো, কারাতেসহ নানা রকমের শারীরিক কসরত শেখাতে পারেন। তাকে শক্তিশালী করুন মননে এবং শারীরিক শক্তিতে। কোনো বিপদে সে যেন সাহস না হারিয়ে প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াতে পারে। এককথায়, ভয়কে জয় করার শিক্ষা দিন।

‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’— এই উক্তির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে বলা যায়, পরিবারের একক কোনো সন্তান যেন তার বাবা-মার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে। সেইসঙ্গে ঝামেলামুক্ত জীবন যাপন করার মাধ্যমে ভালো থাকে। মনে রাখা চাই, সন্তানকে সবকিছু শেখানো যে বাবা-মা’রই দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন হতে হবে যথাযথ। তবেই সন্তান সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে।

সন্তানকে সালাম ও শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস করানো:

ছোট বাচ্চাদের সালামের অভ্যাস করাবেন। তাদেরকে বলবেন, আম্মু! অন্য কাউকে দেখলে সালাম করতে হয়। সালামের শব্দগুলো তাকে শুদ্ধ করে শিখিয়ে দিবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, افشوا السلام بينكم

তোমরা পরস্পরে খুব বেশি সালাম আদান প্রদান করো।

তাই আমাদের উচিত বাচ্চাদের বেশি বেশি সালামের অভ্যাস করানো। এতে তার মনে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হবে। তার যে কোনো (depression) মনমরা ভাব দূর হয়ে যাবে। তখন অন্য কারো সাক্ষাতে আর ভীতু হবে না। তার মন থেকে মাখলুকের প্রতি অহেতুক ভয় দূর হয়ে যাবে। সাহসিকতা পয়দা হবে। নির্বুদ্ধিতা ও গুমরিয়া থাকার মানসিকতা দূর হবে।

এমনিভাবে শিশুকে অন্যের শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস করাবেন। ছোট থাকতেই যখন কিছুটা বুঝার মতো হবে, তখন থেকে বাচ্চাকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, কেউ তোমাকে কিছু দিলে, কেউ তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করলে বা তোমার কোনো কাজে সাহায্য করলে তোমার কর্তব্য হলো, সাথে সাথে তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা।

এভাবে মানুষের শুকরিয়া আদায় করতে থাকলে এক সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করাও সে শিখে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

‘যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না। সে মহান আল্লাহ তাআলারও শুকরিয়া আদায় করে না।’

সুতরাং এই গুণটি শিশুদেরকে শেখাতে হবে। আশ্চর্যের কথা হলো, যেখানে শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে আমাদেরকে এতো জোর করে বলা হলো, সেখানে আজ কোন এমন বাবা-মা পাওয়া যাবে, যিনি তার সন্তানকে এই বিষয়টি শিক্ষা দেন?

‘জাযাকুমুল্লাহ’ অথবা ‘জাযাকাল্লাহু খায়রান’ শুকরিয়া আদায়ের এই শব্দগুলো শিশুকে শিক্ষা দিবেন। যাতে করে শিশু নবীজির সুন্নত অনুযায়ী শব্দগুলো শিখে ফেলে।

আফসোস আজকে এই সুন্দর শিক্ষাটি আমরা ভুলে গিয়েছি আর অন্য ধর্মের লোকেরা এই শিক্ষা নিয়ে সভ্য জাতী হিসেবে আজ পরিচিতি লাভ করছে।

শয়তান এবং বদনযর থেকে বাঁচতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর
বাতলে শিশুদের রক্ষাকবচ:

শিশুর সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসা পদ্ধতির উত্তমতর পদ্ধতি হলো নববি যিকির-
আযকার ও চিকিৎসা পরামর্শ।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে রক্ষাকবচ দিতেন, বিভিন্ন কালিমা পড়ে
দম করতেন। তিনি বলতেন, 'তোমাদের বাবা এই শব্দাবলির মাধ্যমে ইসমাইল এবং
ইসহাক আলাইহিমাস সালামকে তাবিয় করতেন :

اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

“আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে সমস্ত শয়তান, কুপ্ররোচনাদানকারী
এবং সমস্ত অশুভ দৃষ্টি থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।” [১৭৩) উরওয়া বিন যুবাইর
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার উম্মে সালামার
বাড়িতে প্রবেশ করলেন। বাড়িতে একটি শিশু কাঁদছিল। রাসূল বললেন :

الا استرقيتم له من العين؟

“তোমরা কি বদনযর থেকে এর রুকইয়ার ব্যবস্থা করোনি?”[১৭৪]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি একটি বাচ্চাকে কাঁদতে দেখলেন। তিনি
বললেন, ‘এই বাচ্চার কী হয়েছে? তোমরা কি এর রুকইয়া করেছ?’[১৭]

সন্তানের অন্তরে ইমানের বীজ বপন:

আখেরি পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন উম্মতের চিন্তায় ব্যাকুল। তিনি বড়দের কথা যেমন ভাবতেন, তেমনি ভাবতেন শিশুদের নিয়েও। মেশকাত শরিফের হাদিসে এসেছে, গ্রাম থেকে এক সাহাবি এসেছেন রাসুলের (সা.) সঙ্গে দেখা করতে। এসে দেখেন রাসুল (সা.) একটি

শিশুকে এমনভাবে আদর করছেন যেন আশ্চর্য হয়ে দেখার মতো ঘটনা। সাহাবি অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি শিশুদের এত মায়া করেন! আমার তো চারটি সন্তান আছে, আমি ওদের কোনোদিন চুমুও খাইনি। কথাটি রাসুলের (সা.) পছন্দ হলো না। রাসুল (সা.) বললেন, দয়াময় আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় থেকে ভালোবাসা কেড়ে নেন, তা হলে আমার কী করার আছে। শিশুমানসে ধর্ম-কোরআন ঢুকিয়ে দিতে পারলে ওই শিশু বড় হয়ে কখনও বিপথে চলে যাবে না। এ জন্য রাসুল (সা.) বাবা-মাকে আদেশ করেছেন, সাত বছর থেকে শিশুকে ধার্মিকতার ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করো। নামাজের আদেশ দাও। বারো বছর থেকে কঠোরতা দেখাও। বিভিন্ন হাদিসে দেখা যায়, মসজিদে নববীতে জামাত হচ্ছে, পেছন থেকে শিশুরা এসে হটগোল করছে। নবীজি (সা.) ইমামতি করছেন, ছোট হাসান-হোসাইন নবীজির কাঁধে উঠে বসে আছেন। এ দৃশ্যগুলো এটাই প্রমাণ করে। নববী যুগের শিশুদের সম্পর্ক ছিল মসজিদের সঙ্গে। বাবা-মায়েরা আত্রহের সঙ্গে শিশুদের মসজিদে নিয়ে আসতেন। বাংলাদেশের মতো একটি ধর্মপ্রধান দেশের বাবা-মায়েরা শিশুদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য রোজার অভ্যাস করাতে চান না। পরীক্ষা এলে রোজা রাখতে দেন না। ঘুমের অসুবিধা হবে, প্রাইভেট পড়া নষ্ট হবে। এ জন্য নামাজ পড়তে দেন না। ক্লাসের বাইরের কোনো পড়া যেমন কোরআন শরিফ, ইসলামী সাহিত্য পড়তে দেন না। ফলে ছোটবেলা থেকেই শিশুমনে গেঁথে যায়, ধর্ম একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার। বুড়োদের ব্যাপার। ফলে তরুণ বয়সেও ধর্মে-কর্মে তাদের চরম অবহেলা দেখা যায়। রোজার সময় বিশ^বিদ্যালয় এলাকায় গিয়ে দাঁড়ালেই এ কথার সত্যতা মেলে। রমজান মাসে দিনে-দুপুরে খাচ্ছে, পান করছে তরুণরা। এ দৃশ্য একটি মুসলিম দেশে বড় বেদনা জাগায়। সন্তানের বিপথে চলার

জন্য বাবা-মা সবচেয়ে বেশি দায়ী। আপনার সন্তানকে যদি বিপথে দেখতে না চান, তা হলে এখন থেকেই ছোট সোনামণিকে রোজায় উৎসাহিত করুন। তাকে বোঝান রোজা মানে শুধু না খেয়ে থাকা নয়, রোজা হলো সব ধরনের অন্যায় থেকে, ফাঁকিবাজি করা থেকে বিরত থাকার সাধনা। সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই নামাজের ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিন। নামাজি সন্তান বড় হয়ে ভালো মানুষ হবে। কখনও সে মিথ্যা বলবে না, ধোঁকাবাজি করবে না মানুষের সঙ্গে। তাই ছোট থেকেই শিশুর মনে গেঁথে দিন ধর্মের মালা। ধার্মিক শিশুরা আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলে হয়তো আল্লাহ এ বিশ^কে মহামারিমুক্ত করবেন। স্মার্টফোন আসক্ত এ প্রজন্মের শিশুদের ধর্মানুরাগী হওয়া ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য খুবই জরুরি।

নেককার সন্তান পরকালের বাবা মায়ের মজ্জির উপায়:

মহান আল্লাহতায়ালা অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে বাবা-মার জন্য অন্যতম একটি নিয়ামত হচ্ছে সন্তান-সন্ততি। কারণ আল্লাহতায়ালাই একমাত্র সন্তান-সন্ততি দানের মালিক।

এই পৃথিবীতে এমন অনেকে মানুষ আছে, যাদের ধন সম্পত্তির কোনো কমতি নেই। কিন্তু কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। আবার অনেকে আছে দিনে আনে দিনে খায়, তার চার পাঁচ সন্তান আছে

মহান আল্লাহতায়ালা অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে বাবা-মার জন্য অন্যতম একটি নিয়ামত হচ্ছে সন্তান-সন্ততি। কারণ আল্লাহতায়ালাই একমাত্র সন্তান-সন্ততি দানের মালিক।

এই পৃথিবীতে এমন অনেকে মানুষ আছে, যাদের ধন সম্পত্তির কোনো কমতি নেই। কিন্তু কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। আবার অনেকে আছে দিনে আনে দিনে খায়, তার চার পাঁচ সন্তান আছে। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, ধন, ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের অলঙ্কার-শোভা (সুরা কাহাফ: ৪৬)।

অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। তিনি যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান

করেন। অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষামাশীল (সুরা শুরা: ৪৯-৫০)।

এজন্য বাবা-মার জন্য সন্তান-সন্তুতিকে বলা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠ উপহার। সন্তান-সন্তুতি জন্ম দেওয়ার পরই বাবা-মার কাজ শেষ নয়। তাদের সং পথে পরিচালিত বাবা-মার অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। কারণ সন্তান দুই ধরনের হয়- সুসন্তান ও কুসন্তান।

সুসন্তান বাবা-মার জন্য দুনিয়াত ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। আর কুসন্তান বাবা-মার জন্য অভিশাপ। কারণ কুসন্তানের জন্য বাবা-মা দুনিয়াতে অপমানিত হওয়ার পাশাপাশি হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে আসামি হিসেবে দাঁড়াতে হবে।

সুসন্তানকে ইসলামের পরিভাষায় নেককার সন্তান বলা হয়। নেককার সন্তান এই দুনিয়ার জন্য বরকতময় আবার পরকালেরও সঞ্চয়পত্র। মানুষ মৃত্যুর পর আমলের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু আমল দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় করে যাওয়ার কারণে তার সাওয়ার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে।

হজরত আবু হুরাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল কখনো বন্ধ হয় না। এক, সদকায়ে জারিয়া, দুই, ওই ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, তিন, নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (সহিহ মুসলিম: ১৬৩১, সুন্নে আবু দাউদ: ২৮৮০)

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন খুব কঠিন। মৃত্যুর পর যেখানে এই পৃথিবীর কোনো ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য কাজে আসবে না। কেউ চাইলেই নিজের ভুলগুলো সংশোধন এবং আমল বাড়িয়ে হাশরের ময়দানে নাজাতের ব্যবস্থা করতে পারবে না। কিন্তু, মৃত্যুর পরও তিনটি পদ্ধতি আমল জারি থাকে।

এই তিনটি আমলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেককার সন্তান।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল-কুরআনে পৃথিবীর সকল সন্তানদের তাদের বাবা-মার জন্য তিনটি দোয়া শিখিয়েছেন। বাবা-মা জীবিত কিংবা মৃত্যু যে অবস্থায় থাকুক না কেন, প্রত্যেক সন্তানের দায়িত্ব হলো প্রতিদিন এ দোয়াসমূহ পাঠ করা।

এ দোয়াসমূহ হলো, এক. রাক্বির হাম্ভুমা কামা রাক্বায়ানি সাগিরা। অর্থ: (হে আমাদের) পালনকর্তা ! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (সুরা বনি ইসরাইল: ২৪)

দুই. রাক্বানাগফিরলি ওয়ালিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মুমিনাও জ্বালিমিনা ইল্লা তাবারা। অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার বাবা-মাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং আপনি জালেমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না। (সুরা নূহ:২৮)

তিন. রাক্বানাগফিরলি ওয়ালিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিলুমুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার বাবা-মাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। (সুরা ইব্রাহিম: ৪১) এই দোয়াগুলোতে রয়েছে সন্তান-সন্ততি ও মুমিন নারী-পুরুষ সবার জন্য কল্যাণকর।

প্রত্যেক বাবা-মার উচিত আল্লাহতায়ালায় নিকট নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করা। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের নেক সন্তান চাওয়ার পদ্ধতিটি আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বার্ষিক্যে উপনীত হওয়ার পর আল্লাহর নিকট বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস দানকারী (সুরা আশ্বিয়া: ৮৯)।

আল্লাহতায়ালা হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাকে হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম দান করেছিলেন। আবার মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহ নিকট দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে এক সৎকর্মশীল সন্তান দান করেন (সুরা আস-সাফফাত-১০০)।

অতঃপর আল্লাহতায়ালা তাকে ইসমাইল আলাইহিস সালামকে দান করেন। কিন্তু আমাদের দেশে সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট না চেয়ে বিভিন্ন মাজার, দরগাহ কিংবা পীর বাবার নিকট চাই। এগুলোকে কখনো ইসলাম সমর্থন করে না।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তান-সন্ততি দিতে পারে এ রকম বিশ্বাস করা শিরক। আর শিরক হচ্ছে জঘন্যতম জুলুম। পৃথিবীর সকল পিতাদেরকে আল্লাহতায়ালা একটি দোয়া আল-কুরআনে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

দোয়াটি হলো: রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াবিনা ওয়া জুররিয়াতিনা কুররাতা আইয়ুনি ওয়াবআলনা লিলমুত্তাক্বিনা ইমামা।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করেন এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করেন। (সুরা ফুরকান:৭৪)

তাই প্রত্যেক বাবা-মার উচিত তাদের সন্তানদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা। আল্লাহতায়ালা সকল মুসলমানদের নেককার সন্তান দান করুক এবং বাবা-মাকে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুক।

পরিশেষে, মুসলমানের সন্তান-সন্ততি যেন পরকালে যেন তাদের বাবা-মার মুক্তির কারণ হয় এই কামনা করছি।

সন্তানের নৈতিক শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা:

শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে। বড়রা কী করে, তা দেখে দেখে শিশুরা সেটা শিখতে চেষ্টা করে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাই শিশুদের সঙ্গে পরিবারের সদস্য, বাবা-মায়ের আচরণ মার্জিত, সুন্দর ও শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। শিশুদের সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা তাদের বিপথগামী করে অথবা তাদের কচি মনে খারাপ ধারণা তৈরি করে।

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। কাজেই আদর্শ সমাজ ও উন্নত পরিবেশে শিশুদের গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা কেমন করে উন্নত চরিত্র ও আদর্শের অধিকারী হতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। শিশুদের আদর্শবাদী করে গড়ে তুলতে না পাড়লে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে না। শিশুদের চরিত্র গঠনে অভিভাবকদের সদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। নরম কাদা-মাটিসদৃশ শিশুরা শৈশবে যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তার প্রভাব তার জীবনে স্থায়ী হয়ে যায়। এ কারণে পরিবার হচ্ছে শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। মা-বাবাকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে এবং ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে সন্তানদের প্রতিপালন করতে হবে।

মানব শিশুর বেড়ে ওঠার প্রাথমিক কালগুলোকে সাধারণত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে ভাগ করা যায়-শিশুকাল, কিশোরকাল ও যৌবনকাল। সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল ধরা হয়। এ সময়টিতে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন, অর্থাৎ এ সময়ে সে যা খুশি করবে। এভাবে শিশু প্রথম সাত বছর কাটিয়ে দ্বিতীয় সাত অর্থাৎ আনুগত্য ও আদেশ পালন করার পর্বে উপনীত হবে। এ পর্বে শিশুকে আর স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হবে না। বরং তাকে বাবা-মা বা অন্যান্য গুরুজনের কথা মেনে চলতে হবে। এ সময় থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যদি একটি শিশু যথাযথভাবে বেড়ে ওঠে, তাহলে তৃতীয় সাত বছর অর্থাৎ একুশ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুটি হয়ে উঠতে পারে সংসার পরিচলনায় মা-বাবার যথার্থ সহযোগী।

শৈশবকালের প্রথম পর্বে মা-বাবার আচরণগত ত্রুটিই যুবসমাজের অধিকাংশ সমস্যার জন্য দায়ী। বাবা-মা সন্তানের আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলোর প্রতি কোনোরকম

মনোযোগ না দেওয়ার কারণে সন্তানও মা-বাবার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। আর এভাবেই সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ দূরত্ব সন্তানকে বিপথগামী করে ফেলে। তাই সন্তানকে ভালোবাসতে হবে। তার আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। তার বেড়ে ওঠার যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশুর ভবিষ্যৎ যে পিতা-মাতার ওপর নির্ভর করে, তা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে হবে।

পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর শিশুর জন্য একটি সাজানো বাগান দরকার। মা-বাবার ঘরটাই হয়তো শিশুর জন্য সাজানো বাগান। কিন্তু এই পৃথিবীটাকে কি আমরা করতে পেরেছি শিশুর জন্য বাগানের মতো? অথবা সুকান্তের সেই বাসযোগ্য পৃথিবী? হয়তো পেরে উঠি না আমরা; কিন্তু শিশুটিকে আমরা যদি বড় করে তুলি আপন মমতায়, সঠিক পরিচর্যায়, তাহলে সে হয়তো তার পৃথিবীটাকে তার মতো করেই বাসযোগ্য করে তুলবে। মনের মতো সাজাবে সেই বাগানটাকে।

মা-বাবার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয়:

পৃথিবীতে মা-বাবা সন্তানের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। জন্মের পর থেকেই পরম যত্নে সন্তানকে তারা আগলে রাখেন। সন্তানের উন্নত জীবন ও সুখের জন্য হাসিমুখে শত কষ্ট মেনে নেন। নিজেদের সঞ্চিত সব কিছু অকাতরে বিলিয়ে দেন। পিতা-মাতা সন্তানের জন্য রবের পক্ষ হতে বিশেষ নেয়ামত ও উপহার। তাদের ঋণ অপরিশোধযোগ্য। তাই সন্তানকে তাদের ব্যাপারে আদেশ করা হয় সদাচরণের, যথাযথ হক আদায়ের। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ‘তোমরা পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যবহার কর, পিতা-মাতার কোনো একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বল।’ (সূরা বনি ইসরাঈল : ২৩)। রাসূল (সা.) ইরশাদ

করেছেন, ‘পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ (ইবনে হিব্বান: ৩৩৮৪)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে পিতা-মাতার হক ও মর্যাদার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সন্তানের উচিত পিতা-মাতা জীবিত থাকাকালীন তাদের হক আদায়ের পাশাপাশি মৃত্যুর পরেও তাদের জন্য কল্যাণকর কাজ করা। তাদের জন্য নেকের ধারা অব্যাহত রাখা। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন ‘যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সদকায়ে জারিয়া। ২. এমন জ্ঞান যার দ্বারা উপকার হয় এবং ৩. পূণ্যবান সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে।’ (মুসলিম: ৪১১৫)। পিতা-মাতার মৃত্যুপরবর্তী সময়ে নানাভাবে তাদের জন্য কল্যাণ ও নেকের ধারা অব্যাহত রাখা যায়। নানা উপায়ে তাদের উপকার করা যায়

কল্যাণ কামনা

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক মৃত্যুপরবর্তী সময়েও বাকি থাকে। সন্তান পারে না পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে ভুলে যেতে। সন্তান মারা গেলে পারে না পিতা-মাতা তাকে ভুলে যেতে। তাই পরম প্রিয় পিতা-মাতার জন্য সন্তান সর্বদা কল্যাণ কামনা করবে। আর কল্যাণ কামনার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন। তাদের সম্মানকে আরও বৃদ্ধি করেন। পিতা-মাতার দোয়া করার ব্যাপারে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-মাতাকেও এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও, যে ঈমানের অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করেছে।’ (সূরা নূহ : ২৮)। ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে রাসুল (সা.) বর্ণনা করেন, ‘আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তার নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কীভাবে বৃদ্ধি হলো? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণে।’ (ইবনে মাজা : ৩৬৬০)

ঋণ পরিশোধ ও অসমাপ্ত ভালো কাজ পূরণ করা

ঋণ এক ধরনের আমানত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের জন্য অন্যতম কর্তব্য হলো যথাযথভাবে তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অনেক সম্মানী, তবু আল্লাহ তার ঋণ ক্ষমা করবেন না। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘ঋণ ছাড়া আল্লাহ শহীদের সব কিছু ক্ষমা করে দেন।’ (মুসলিম : ৪৯৯১)। পুণ্য কাজসমূহ সমাপ্তকরণ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা নবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আমার মা হজ করার মানত করেছিলেন। এরপর তিনি হজ করার আগেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করব? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ কর। মনে কর যদি তার ওপর ঋণ থাকত তা হলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, অবশ্যই। তিনি বললেন, কাজেই তার ওপর যে মানত আছে তা তুমি পূর্ণ কর।’ (বুখারি : ৭৩১৫)

নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক

সামাজিক স্থিতি ঠিক রাখতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অতি জরুরি। পিতা-মাতার জীবিত থাকাকালীন যেমন জরুরি তাদের মৃত্যুর পরেও সন্তানের জন্য উচিত তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায় করা। এ বিষয়ে নবী (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ (বুখারি : ৫৯৮৪)। নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি সন্তানের উচিত পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রাখা এবং তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসুলুল্লাহকে (সা.) বলতে শুনেছি, ‘সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তাদের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা।’ (মুসলিম : ৬৪০৯)

পিতা-মাতার নামে দান

দান অত্যন্ত মহৎ কাজ। ভালো যেকোনো কাজেই প্রকাশ্য-গোপনে দান করা যায়। সাধারণ দান-সদকার পাশাপাশি কখনও কখনও মৃত পিতা-মাতার জন্য দান করা

উচিত। সাহাবিরাও তাই করতেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, ‘এক ব্যক্তি নবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা মারা গেছে এবং তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন; কিন্তু অসিয়ত করেননি। তার পক্ষ থেকে দান করা হলে কি তার গুনাহ ক্ষমা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।’ (মুসলিম : ৪১১১)। অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, সাদ বিন উবাদাহর (রা.) মা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রাসুলকে (সা.) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমি অনুপস্থিত থাকাকালে আমার মা মারা গেছেন। এখন যদি তার পক্ষ থেকে কিছু দান করি তা হলে তিনি উপকৃত হবেন কি?’ নবীজি (সা.) বললেন, ‘হ্যাঁ হবে।’ (বুখারি : ২৭৫৬)। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের প্রতি সদাচরণের এবং মৃত্যুবরণ করলে তাদের প্রতি সর্বোত্তম সদাচরণের তওফিক দান করুন। আমিন।

উপসংহার:

সন্তান মা-বাবার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল। তাদের শত স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। সব মা-বাবাই চায় তাদের সন্তান সফল হোক, দিন শেষে প্রশান্তিময় জীবন লাভ করুক। নিজেরাও ভালো থাকুক, এবং বাবা-মাকেও ভালো রাখুক। অথচ বাস্তব চিত্র ভীষণ আলাদা। অধিকাংশ পিতামাতাই সন্তানদের নিয়ে হতাশ। তাদের অশান্তির যেন শেষ নেই। সন্তান বখে গেছে, সবসময় দুর্ব্যবহার করে, কথায় কথায় গালি দেয়, দ্বীন মানে না, দ্বীনের বিরুদ্ধে চলে ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ। ধীরে ধীরে স্বপ্নের সন্তানই যেন হয়ে ওঠে অসহনীয় বিরাট এক বোঝা!

আসলে স্বপ্ন দেখলেই তো আর সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণ হয় না! সন্তানকে ভালো মানুষ বানাতে শারীআত ও ফিতরাত অনুসারে শৈশব থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হয়। তার হৃদয়-ভূমিতে তারবিয়াতের বীজ বপন করতে হয়। পথ দেখাতে হয় সুনিপুণ দক্ষতায়।

সন্তান তার মা-বাবার কাছে একটি আমানত। তার পরিচ্ছন্ন হৃদয় থাকে খুবই সরল। যেকোনো নকশা ও অঙ্কন থেকে তা থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার হৃদয় ক্যানভাসে সবকিছুই আঁকা যায়। যেকোনো তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে সেদিকেই তা চলে যায়। সুতরাং যদি তাকে কল্যাণ শেখানো হয় এবং এর উপরই তাকে গড়ে তোলা হয় তাহলে দুনিয়া আখিরাতে সে হবে সৌভাগ্যবান। তার মা-বাবা ও অভিভাবক হবেন সম্মানিত। আর যদি তাকে অবহেলা করা হয় এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো ছেড়ে রাখা হয় তাহলে সে হবে দুর্ভাগা, মা-বাবা এবং অভিভাবককে নিতে হবে এর দায়ভার।

যে চায় মানবসদস্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে, সত্যনিষ্ঠ একজন মুরগিব—আমাদের নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্তিন আঁকড়ে ধরতে তার জন্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে সন্তান প্রতিপালনের নববি নির্দেশিকা ; একটি ইসলামি প্রজন্ম গড়ার মূল্যবান গাইডলাইন। এতে তুলে ধরা হয়েছে মুসলিম সন্তান প্রতিপালনে রাসূলের যত্নশীলতা। যার ব্যাপ্তি হলো বাবার ঔরসে শিশুর অবস্থান করা থেকে নিয়ে একজন পরিপূর্ণ বাল্যে হওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়।

রেফারেন্স: সহায়ক বই

"সন্তান আল্লাহর ওলী হয় কীভাবে"

"নববী তরবীয়াত"

"সন্তানের ভবিষ্যৎ"

তথ্যসূত্র

<https://www.jugantor.com/islam-life/450206>

<https://www.jugantor.com/todays-paper/little-talk/618391>

<https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=140359>

<https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=131170>